The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

কূটনৈতিক সম্পর্ক: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

[Diplomatic Relations: Origin and Development]

Md. Rabiul Aual
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 30 January 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Diplomatic, Relations, Origin, Development

ABSTRACT

The history of the origin and development of diplomatic relations is a very important and significant study because its history provides a fundamental understanding of the nature of diplomacy. Diplomatic relations is not a modern innovation, rather it had been practiced in ancient times. It is as old as human civilization itself. Modern diplomacy is not older than 400 years. The genesis of diplomacy goes back to Allah and his emissaries, the angels or messengers. It is believed and accredited that the first diplomats were angels or messengers of Allah from Heaven to Earth. So, we can say that man is a diplomat by nature. Diplomacy has gone through many phases and procedures of development to arrive at its present stage. In the modern world, diplomacy is known as the lubricant for the machinery of international relations. It is a science of communication, dealing, and negotiation among nations through their bureaucratic channel. Diplomacy plays a paramount part in diffusing tension, signing treaties to make peace with enemies, exchanging prisoners of war, establishing contact with other countries, and cooperating on global issues such as climate change, human rights, and trade. This paper tries to focus on the diplomatic practices managing from ancient civilizations like Greek, Roman, Mesopotamia, Egypt, Jews, Islamic, Chinese, and Indian to the modern era because the conduct of diplomacy is best understood when studied in the light of its historical roots.

১. ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, কূটনৈতিক সম্পর্ক। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে এর উদ্ভব। আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত ছিল কূটনৈতিক দূত ও প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা। কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয় মূলত প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করত। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমানে তা শৈল্পিক রূপ লাভ করে। ইসলাম বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার কাফির-মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার সময় কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তির কারণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করলে রাসূল সা. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত প্রেরণ করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। রাসূল সা. এর ইন্তিকালের পরে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাগণের সময়কালে বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে কূটনৈতিক তৎপরতা আরো বিকশিত হয় এবং গতিশীলতা লাভ করে।

২. কূটনৈতিক সম্পর্কের পরিচয়

আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

'কূটনৈতিক সম্পর্ক' কে ইংরেজীতে Diplomatic Relations বলা হয়। 'কূটনীতি' হচ্ছে কুটিল নীতি; কপটতা; কৌশলপূর্ণ রাজনীতি (প্রধানত এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের)।[১] শব্দটি আধুনিক পরিভাষা হওয়ায় পূর্বের আরবী অভিধানগুলোতে 'কূটনীতি' শব্দের কোন অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তবে আধুনিক আরবী অভিধানে শব্দটিকে دبلوماسية (দিবলূমাসিয়্যাহ) হিসেবে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২] বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা বিষয়ক আলোচনায় আরবীয়গণ 'কূটনীতি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতগণ ও এতদসংশ্লিষ্ট লেখকগণ 'কূটনীতি'র যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তন্মধ্যে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

১. স্যার আর্নেস্ট স্যাটো (Sir Ernest Sattow) বলেছেন, "Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relation between the governments of independent states". 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারী সম্পর্ক পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধি ও কৌশল প্রযুক্ত হয় তার নাম কূটনীতি'।[৩]

২. প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন (Padelford and Lincoln) বলেছেন যে, "Diplomacy may be defined as the process of representation by which states customarily deal with one another in terms of peace". 'কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের এমন এক প্রক্রিয়া বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রথাগতভাবে একে অপরের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে'।[৪]

৩. 'আল-মাওসূ'আতুল 'আরাবিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, هي نظم ووسائل الاتصال بين الديل الأضاء في الجماعة الدولة، هي وسيلة جراء المفاوضات بين الأمم. ويطيق اليوم بعض أهل الأدب هذا التعبير علي الخطط والوسائل التي تستخدمها الأمم عندما تتفاوض. '(কূটনৈতিক সম্পর্ক হলো) আন্তঃরাষ্ট্রীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আলোচনা পরিচালনার মাধ্যম বা ব্যবস্থা। বর্তমানে কিছু সাহিত্যিক পণ্ডিত এই অভিব্যক্তিটি এমন পরিকল্পনা এবং অর্থে প্রয়োগ করে, যখন আন্তঃরাষ্ট্রগুলো আলোচনা করে তখন ব্যবহার করে'।[৫]

৪. 'আল-মাওসু'আতুল 'আরাবিয়্যাহ আল-মুওয়াসসারাহ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, نظم ووسائل الاتصال بين الدول الإعضاء في الجماعة الديلية، والأدات التي تستخدمها هذه الدول في تسبير علاقتها الواحدة بلأخري وتنفيذ سياستها الخارجية 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগের এমন সিস্টেম বা মাধ্যম, যাতে করে এই দেশগুলো একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে এবং পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের জন্য তারা যে সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে, সেটাই কূটনৈতিক সম্পর্ক'।[৬]

৩. কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমান সময়ে আলোচিত বিষয় হলেও এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। সময়ের সঙ্গে এর প্রকৃতি ও প্রয়োগের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের সম্রাট বা রাজা-বাজশাহদের নিজেদের প্রয়োজনে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রদস্লেভ ও নোমিলীনের মতো কিছু গবেষকের মতে, أن الدبلوماسية قديمة قدم الشعوب ذاتها 'কূটনীতি মানুষের মতোই প্রাচীন'।[৭] এ কথার ভিত্তিতে বলা যায় যে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম আ. এর সময়কাল থেকেই কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎপত্তি। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত প্রথম বার্তাবাহক তথা দূত। তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান ও নির্দেশনা লাভ করেন এবং মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যদিও হযরত আদম আ. সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেননি, তবে তার মাধ্যমে মানব সমাজের সূচনা এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তি স্থাপন করে। মূলত প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিবদমান দল, গোত্র ও শক্তির মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাত থেকেই পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও যুদ্ধবন্দী বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রয়োজনে কূটনীতির জন্ম হয়।[৮] ইতিহাস পর্যালোচনায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, প্রাচীন চীন, ভারত, মিশর, গ্রীস, ইতালি, বাইজেন্টাইন প্রভৃতি রাষ্ট্রে কূটনীতির কৌশল উদ্ভাবন হয়েছিল এবং সেখান থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। প্রাচীন যুগে গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলসন এর মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ' খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশত অব্দের দিকে নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময় এমন স্বাভাবিক ছিল যে, তাকে আধুনিক কূটনৈতিক যোগাযোগের মতোই মনে হতো'।[৯] তবে আধুনিক কূটনীতির যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের সূত্র ধরে।[১০] 'ফরাসি ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স' আরও ইঙ্গিত করে যে, কূটনীতি প্রাচীনকালে প্রতিবেশী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং বোঝাপড়ার মাধ্যম হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের একটি ব্যবস্থায় বিকশিত হয়েছিল।[১১] আধুনিক রাজনীতিতে কূটনীতির উৎপত্তি ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যেমন :

৩.১ গ্রীক যুগে কূটনীতি

অনেক লেখক গ্রীকদের সময় এবং প্রাচীন গ্রীক নগর-রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের সময় থেকে সংগঠিত কূটনীতির সূচনা বলে মনে করেন। তৎকালীন গ্রীক শহরগুলোর পরিস্থিতি কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অনুশীলনের উত্থান সম্ভব করে তুলেছিল। আর নগর-রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি অনেক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যারা সাধারণ বন্ধন এবং স্বার্থের দ্বারা সংযুক্ত ছিল।[১২] ফলে এই শহরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ, যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সহযোগিতার ক্ষেত্রে হোক বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হোক।[১৩] অধ্যাপক নিকলসন

উল্লেখ করেন যে, গ্রীকরা কূটনৈতিক যোগাযোগের একটি উদ্ভাবনী এবং বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা পারস্পরিক সম্মতি বা পুনর্মিলনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির নীতি সম্পর্কে জানত, যার লক্ষ্য ছিল আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধ বন্ধ করা। এমনকি তারা অস্থায়ীভাবে স্থানীয় যুদ্ধবিরতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন, চুক্তি এবং মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কেও জানত।[১৪]

বছরের পর বছর ধরে গ্রীক কূটনীতি বিকশিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, কূটনৈতিক প্রবক্তাগণ কূটনীতির নিম্ন স্তরের চেয়ে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেন। সবচেয়ে সুবক্তা, দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দূতদের নির্বাচিত করা হতো। এক শহরের কূটনৈতিক দূতের কাজ ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্য শহরের প্রতিনিধির মুখোমুখি হওয়া। যে শহরে প্রতিনিধিদল পাঠানো হতো, সেই শহরের পিপলস কাউন্সিলের সামনে আলোচনা পরিচালনা করা হতো। তৃতীয় পর্যায়ে, যখন নগর-রাষ্ট্রের সভ্যতা বিকশিত হয় এবং যোগাযোগের মাধ্যম উন্নত হয়, তখন কূটনৈতিক মিশনগুলো আরও ঘন ঘন হয়ে ওঠে, স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের কাছাকাছি হয়ে ওঠে। এটি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অনাক্রম্যতা সম্পর্কিত নিয়মগুলোর একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতেও সহায়তা করে।[১৫]

৩.২ রোমান যুগে কূটনীতি

রোমান যুগে কূটনীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে রোমানদের তেমন কোনো অবদান নেই বললেই চলে, তবে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অবশ্য পূর্বাঞ্চলীয় রোমক সাম্রাজ্যে কূটনীতির প্রয়োগ কিছুটা ছিল। এ অঞ্চলের সম্রাটগণ বিদেশে স্থায়ী প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত তথ্যকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করত। এ সকল প্রতিনিধি ধীরে ধীরে ঝানু হয়ে উঠেন এবং প্রতিনিধিত্ব, পর্যবেক্ষণ, তথ্যপ্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। মূলত রোমানরাই কূটনীতির প্রথম প্রয়োগ ঘটিয়ে ছিল। তাই অনেকেই রোমানদেরকে কূটনীতি প্রয়োগের 'অগ্রদূত' বলে অভিহিত করেন।[১৬]

রোমান রাষ্ট্র সামরিক শাসনের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রোমানরা এমন যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল যারা অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ এবং অসম যুদ্ধের নীতির উপর নির্ভর করত। তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, বিশ্বের সকল প্রান্তে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা।[১৭] তারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক উপায়ের চেয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে এবং অন্যান্য নিপীড়িত মানুষ ও উপজাতির উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পছন্দ করত।[১৮]

কূটনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে রোমানরা পারস্পরিক চুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল এবং সেগুলো মেনে চলা ও সম্মান করার উপর ব্যাপক জোর দিয়েছিল। রোমানরা তাদের সাথে বিরোধে লিপ্ত ব্যক্তিদের দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দিতো। যথা: ক. বিরোধী বিষয়ের উপর একটি খসড়া চুক্তি করা অথবা খ. প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবেশ করা। ফলশ্রুতিতে কূটনীতির ব্যর্থতা ও তার অনুশীলনের উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী অসম্ভব হয়ে উঠত। 'ইযযুদ্দীন ফাওদাহ এই বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, 'রোমানরা সাংস্কৃতিক, আইনি এবং সামরিক ঐতিহ্য তৈরিতে যতটা সফল হয়েছিল, কূটনৈতিক শিল্প গঠনে তারা একই প্রভাব ফেলতে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছিল'।[১৯] কিন্তু রোমান যুগে কূটনৈতিক অনুশীলনের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, তারা কূটনৈতিক তত্ত্বের বিকাশে কিছু অবদান রেখেছিল। কেননা তখন আন্তর্জাতিক চুক্তি, নথিপত্র সংরক্ষণ এবং তা অধ্যয়নের জন্য প্রশিক্ষিত আর্কাইভিস্ট পদের বিস্তার ঘটেছিল। ফলস্বরূপ, কূটনৈতিক পদ্ধতি এবং প্রোটোকল বিশেষজ্ঞদের একটি দল গঠিত হয়েছিল। এইভাবে, রোমান কূটনীতি চুক্তির ধারণা বিকাশে অবদান রেখেছিল এবং কূটনীতির বৈজ্ঞানিক দিকটি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। এর মৌলিক কারণ ছিল, কূটনীতিপূর্ব প্রতিনিধিত্ব এবং আলোচনার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা।[২০]

৩.৩ বাইজেন্টাইন যুগে কূটনীতি

বাইজেন্টাইন যুগকে 'মধ্যযুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুগে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে আধুনিক কূটনীতিবিদ্যা একটি সুনির্দিষ্ট পেশা হিসেবে সর্বপ্রথম ইতালিতে গড়ে ওঠে। ইতালিতে নগর-রাষ্ট্রগুলো বিদেশে তাদের স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করত। এ সময় ম্যাকিয়াভেলীর চিন্তাধারার মাধ্যমে কূটনীতি নতুন রূপ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Prince"-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ শতকে ইতালির নগর-রাষ্ট্রসমূহ লন্ডন, প্যারিস এবং রোমান সাম্রাজ্যে স্থায়ী কূটনীতিক মিশন গঠন করেছিল।[২১]

খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলে রোমান সাম্রাজ্য দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিলান রাজধানী সহ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, যা বাইজেন্টিয়ামে উত্থিত হয়েছিল এবং কনস্টান্টিনোপলে একটি নতুন রোম প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল। এই রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[২২] রোমানদের দুর্বলতার কারণে বাইজেন্টাইনরা রোমানদের বিপরীত কূটনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। রোমানরা কূটনৈতিক শক্তিতে খুব বেশি যত্নবান ছিল না। এজন্য কূটনৈতিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইনদের

অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২৩] আশেপাশের জনগণের কাছ থেকে আসা বিপদ মোকাবেলায় বাইজেন্টাইনরা কূটনৈতিক সম্পর্ককে জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেছিল। তারা অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক আলোচনার আশ্রয় নেয়। তারা তাদের শত্রুদের একে অপরের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে এবং তাদের ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে দুর্বল করার জন্য চালাকি এবং প্রতারণাকে ব্যবহার করত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি পক্ষকে বোঝানোর জন্য যুক্তি এবং প্রমাণ সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল। কেননা নিজ দেশের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা অন্য পক্ষের বিরোধিতা করার মধ্যেই নিহিত। এই অভিযানের জন্য এমন একটি বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল যারা আলোচনা শিল্পে অভিজ্ঞ, তথ্য সংগ্রহ করে, শত্রুদের সংবাদ, যোগাযোগ, চিন্তাভাবনা এবং সম্ভাব্য জোট তদন্ত করে, যাতে বিপদ আসার আগেই তা এড়ানো যায়।[২৪] বাইজেন্টাইন যুগে কূটনীতিকগণ যে নতুন পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল কেবল তার দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করা, তা রক্ষা করা এবং তা অন্যদেরকে বোঝানোর মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না। এইভাবে, পর্যবেক্ষক কূটনীতিক, আলোচক কূটনীতিকের স্থলাভিষিক্ত হন।[২৫] বাইজেন্টাইন যুগে কূটনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।[২৬]

৩.৪ মহানবী সা.-এর যুগে কূটনীতি

কূটনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে এযুগকে কূটনৈতিক ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কয়েকটি সামরিক ও আধা-সামরিক অভিযানকালে ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম দূত প্রথার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে রাসূল (দূত) বা *দিবলূমাসী* পরিভাষাটি তখন ব্যবহৃত হয়নি। পরবর্তীকালে এ পরিভাষাটির ব্যবহার দেখা যায়। তৃতীয় হিজরীতে বনু নাজীরের বিরুদ্ধে অভিযানে রাসূল সা. এর সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। দু'বছর সম্মিলিত আরব শক্তিসমূহ যখন মদীনা অবরোধ করে তখন তিনি মুসলিম দূত আওস গোত্রের সা'দ ইবনু মু'আয, খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইবনু উবাদাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা বনু কুরায়যাহ গোত্রের নিকট প্রেরিত হন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের সঙ্গে অতীতে সম্পাদিত চুক্তি সম্বন্ধে বনু কুরায়যাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র ও আক্রমণকারীদেরকে সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার প্রশ্নে সাবধান বাণী শুনানো, যার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।[২৭] সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে নবী সা. হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে কুরাইশদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি আরব ও অনারব সকল মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তিনি চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন।[২৮] অতঃপর যখন তিনি আমীর ও রাজাদের কাছে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন একদিন তার সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেন,

يأيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافة، فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم

'হে মানুষসকল! নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমার ব্যাপারে তোমরা মতানৈক্য করো না যেমন হাওয়ারিরা ঈসা আ. এর ব্যাপারে মতানৈক্য করেছিল। সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সা.! হাওয়ারিরা কীভাবে মতানৈক্য পোষণ করেছিল?' তিনি বললেন, 'আমি যার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছি, তিনি তার দিকেই তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন। যাকে তিনি নিকটবর্তী মিশনে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু যাকে তিনি দূরবর্তী মিশনে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তা অপছন্দ করেছিলেন এবং বোঝা মনে করেছিলেন'। ঈসা আ. আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। অতঃপর যারা বোঝা বা ভারী মনে করেছিল তারা সেই জাতির ভাষায় কথা বলতে শুরু করে যে জাতির কাছে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। ঈসা আ. বললেন, 'এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সুতরাং তোমরা এটা মেনে নাও বা এ পথে চলো'।[২৯]

অতঃপর নবী সা. তাঁর সাহাবীদেরকে হিরাক্লিয়াস, কিসরা, আল-মুকাওকিস, আল-নাজাশি এবং অন্যান্যের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। তাঁর সাথীরা তাঁর ইচ্ছায় সাড়া দিয়েছিল এবং তাঁর জন্য একটি রূপার আংটি তৈরি করা হয়েছিল, যার উপর محمد رسول الله 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' খোদাই করা হয়েছিল, যা দিয়ে চিঠির উরপ সীলমোহর করা যায়। আর নবী সা. আরব উপদ্বীপের ভিতরে-বাহিরে সফল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তা সে আরব উপজাতিদের সাথে হোক বা অন্যান্য জাতির সাথে হোক। অনুরূপভাবে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর সাথে এবং মিশরের রাজা মুকাওকিসের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করেছিরেন। এমনকি তাদের সাথে উপহার ও জ্বালানি বিনিময় করেছিলেন। তিনি নাজরান ও জিজানের খ্রিস্টানদের সাথে, কাজাখস্তানের সাথে, রাজা আকদার বিন আব্দুল মালিক আল-কিন্দির সাথে এবং মুন্দির গোত্রের আল-হিরার আরবদের সাথেও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলেন; তাহল: ইয়াসরিব (মদীনা)। এর অনেক কারণ ছিল, যার মধ্যে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেখানে তাঁর আনসারদের ব্যাপক উপস্থিতি। আর এর জনগণের জন্য এমন একটি আরবীয় বাহিনী প্রয়োজন, যারা এর উপর আধিপত্য বিস্তারকারী ইহুদিদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে। কারণ এটি আরব উপদ্বীপে এবং আল্লাহর পবিত্র ঘরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।[৩০]

মদীনায় মুহাজিররা আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। আর তারাই ছিল সেইসব লোক, যারা শহর পরিচালনার জন্য একটি আইনি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঘোষণা করেছিল। যাতে করে অববিশ্যকভাবে মদীনার রাজনৈতিক বিষয়গুলো সংঘবদ্ধ হয় এবং সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয়। নবী সা. এর উপর রিসালাত অবতীর্ণের পর বিভিন্ন রাজা, আমীর এবং গোত্রপতিদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে, তিনি এমন কোনও রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করেননি, যা তাকে ইসলামী দাওয়াতের বিষয়ে এই সকল লোকের সাথে কথা বলতে সক্ষমতা দান করবে। তাঁর রাজনৈতিক সক্ষমতার জন্য একটি প্রশস্ত ও উন্মুক্ত জায়গার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর মদীনায় নবী সা. প্রথম যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা হল: ইহুদীদের উপস্থিতি, যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত এবং কুরাইশ গোত্র সহ প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথে জোটবদ্ধ ছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ইহুদিদের সাথে সংঘাত তার কাজ নয়, বরং নতুন নগর-রাষ্ট্রের জন্য দৃঢ়তা, শক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার সক্ষমতা প্রয়োজন। এছাড়া তাকে নতুন দ্বীন প্রচার এবং রাজা-আমীরদের সম্বোধন করার জন্য নিজেকে নিবেদিত করা। শহরাঞ্চলে যদিও খ্রিস্টানরা প্রভাবশালী নয়, তবুও দ্বীপে তাদের উপস্থিতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক তৈরি করা প্রয়োজন। এই কারণে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তারপর রাজা ও আমীরদের সম্বোধন করা প্রয়োজন ছিল।[৩১]

ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বজনীন। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য আসমান থেকে আগত বাণী। ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি ছাড়া একজনের সাথে অন্যজনের কোন পার্থক্য নেই। অতএব, সকল মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করা মুসলিমদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ইসলামের প্রসার এবং এর পতাকা উত্তোলনে কূটনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবী মুহাম্মদ সা.-এর যুগে পৃথিবীতে ইসলামের প্রসারে বিভিন্ন দেশে চিঠি, প্রতিনিধিদল এবং রাষ্ট্রদূত প্রেরণের মাধ্যমে মিত্রতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নবী সা. জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রদূতরা কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা ভোগ করেন। বর্ণিত আছে যে, নবী সা. যখন মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার কাছ থেকে দু'জন বার্তাবাহককে পেয়েছিলেন, যারা দাবি করেছিল যে তাদের বার্তাবাহক একজন নবী...। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামা ইবনু নু'আইম ইবনু মাসঊদ রা. তাঁর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ جَاءَهُ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِكِتَابِهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا: «وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا».

'আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যখন ভণ্ডনবী মুসাইলিমাতুল কাযযাবের চিঠি নিয়ে দু'জন দূত এসেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'সে (মুসাইলিমা) যা বলেছে, তোমরাও কি অনুরূপ বলবে'? তারা দু'জন বলল যে, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আল্লাহর কসম! যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো, তাহলে আমি তোমাদের উভয়ের গর্দান উড়িয়ে দিতাম'।[৩২]

অতএব, ইসলামে রাষ্ট্রদূতদের সম্মান করা এবং তাদের কূটনৈতিক দায়মুক্তি প্রদান করা সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়, তাদের মতামত যতই ভিন্ন হোক না কেন। ইসলামে কূটনৈতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নিয়ম।

৩.৫ খুলাফায়ে রাশেদার যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক

৩.৫.১ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক

ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক রা. নবী সা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দূতদেরকে রক্ষা করেছিলেন। কেননা তাদের উপর আক্রমণ ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের শামিল। আবূ বকর রা. খলীফা হওয়ার পর তৎকালীন অন্যান্য রাষ্ট্রের নব ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের জন্য কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করেন। তিনি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন সন্ধি চুক্তি করেন। এ মর্মে তিনি মিসরের অধিপতি মুকাওকিস, রোমের অধিপতি কায়সার এবং পারস্যের অধিপতি কিসরার নিকট বিভিন্ন সময়ে দূত প্রেরণ করেন। তাদের নিকট দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করা। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। তিনি রোমের অধিপতি কায়সারের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনজন কূটনীতিবিদকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কায়সার তার এ দাওয়াতকে অস্বীকৃতি জানায়।[৩৩] রোমানরা যখন নবী সা.-এর দূতকে হত্যা করেছিল, তখন নবী সা. রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। অনুরূপভাবে তিনি মুসলিমদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য 'মু'তাহ' নামক স্থানে

রোমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন উসামা ইবনু যায়েদ। কিন্তু নবী সা. অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে অভিযানে পাঠানো হয়নি।[৩৪] নানাবিধ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আবূ বকর সিদ্দীক রা. সর্বপ্রথম উসামা ইবনু যায়েদ রা. কেই সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।[৩৫] এটা তার কূটনৈতিক চিন্তাধারার অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

আবু বকর আল-সিদ্দীক রা. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ করে বার্তাবাহকদের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন: তিনি হাতিব বিন আবি বালতা'আ রা.-কে মিশরের বাদশাহ আল-মুকাওকিসের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। এটি ছিল মিশরে প্রথম যুদ্ধবিরতি। তিনি রোমানদের রাজা সিজার এবং পারস্যের রাজা খোসরুর কাছে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের জন্য তার দূতদের প্রেরণ করেছিলেন। এই যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলো বিদ্যমান যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়াতে। মূলত এগুলোকে এখন আগ্রাসন-পরবর্তী বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তি বলা হয়।[৩৬] অতঃপর ৬৩২ খ্রি. মোতাবেক **১১** হিজরীতে মুগীরা ইবনু শু'বাকে হাযরামাউতে পাঠান, যিনি আল-মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়ার জন্য একটি চিঠি নিয়ে যান।[৩৭] খলীফা আবূ বকর রা. সেনাপতি খালিদ ইবনু আল-ওয়ালীদ রা. কে মুসলিমদের শত্রুদের সাথে যোগাযোগের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন। খালিদ রা. ইরাকের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজপুত্র হরমুজকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখেন, অন্যথা তিনি মুসলিমদের ক্রোধের মুখোমুখি হবেন বলেও ঘোষণা করেন।[৩৮] খলীফা আবু বকর রা. এর রাজত্বকালে তিনি রোমান রাজা হেরাক্লিয়াসের কাছে হিশাম ইবনুল আসকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।[৩৯]

৩.৫.২ উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দূত বা কূটনীতিবিদ নির্বাচনে শর্তারোপ করে বলেন,

يؤذن لكم فيقدم أحسنكم اسما، فاذا دخلتم قدمنا أحسنكم وجها، فاذا نطقتم ميزتكم ألسنتكم.

'তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো, তোমাদের মধ্যে যিনি সুন্দর তাঁর নাম তিনি উপস্থাপন করবেন। অতঃপর তোমরা যখন প্রবেশ করবে তোমাদের মধ্যে চেহারার দিক থেকে যিনি সুন্দর তাঁকেই আমরা অগ্রাধিকার দেবো। এরপর তোমরা যখন কথা বলবে তোমাদের মধ্যে যিনি সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তাঁকেই আমরা প্রাধান্য দেবো।'[৪০] তিনি উপরিউক্ত শর্তের ভিত্তিতে দূত ও কূটনীতিবিদ নিয়োগ করতেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিপতিদের ইসলামের দাওয়াত ও সন্ধি চুক্তি বিষয়ে পত্র দিয়ে কূটনীতিবিদদেরকে প্রেরণ করতেন। ফলে বিভিন্ন অধিপতিদের সাথে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন বড় বড় সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ খলীফার নিকট রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতেন। ঐতিহাসিক ইবনু জারীর আল-তাবারী লিখেছেন যে, যে সময় আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধানের পক্ষ থেকে একজন দূত পাঠানো হয়। খলীফা উমার উক্ত দূতকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং রাষ্ট্রীয় সংলাপ পরিচালনার জন্য 'আমর ইবনুল 'আসকে দায়িত্ব দেন।[৪১]

উক্ত ধারাবাহিকতায় উমার ইবনুল খাত্তাব রা. দূতদের যত্ন নিতেন এবং দূতদের একটি তালিকা তৈরি করতেন, যার মধ্যে দূতদের মাধ্যমে তাঁর কাছে আসা বার্তাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায় হিসেবে বিচারিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। জেরুজালেমের জনগণকে তিনি যে চুক্তি দিয়েছিলেন তা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নিয়মাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী সেরা ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে পরিগণিত।[৪২] খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগ ছিল সুদৃঢ় কূটনীতির আকর, ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার এক অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বেশ কয়েকজন দূত প্রেরণ করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে: সেনাপতি উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. রোমানদের কাছে একটি বার্তা পাঠান, যখন তারা তাকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে চলে যেতে বলে, অন্যথা তারা তাদের অশ্বারোহী এবং সৈন্য নিয়ে তার কাছে আসবে। আবূ উবাইদা রা. তাদের উত্তরে বলেন যে, মুসলমানরা চলে যাবে না কারণ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের এই শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়েছেন। আবু উবাইদার বার্তার বিষয়বস্তু যখন সম্পূর্ণ হল, তখন মুসলিমদের শক্তি দেখে রোমানরা ভয় পেয়ে গেল। তাই তারা তাকে আরেকজন বার্তাবাহক পাঠালো, যাতে তার সাথে আলোচনার জন্য একজন দূত পাঠানো হয়। এরপর সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ সাহাবী মু'য়ায ইবনু জাবাল রা. কে পাঠালেন, যিনি তার ঘোড়ায় চড়ে তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাদের কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন ইসলামের সম্প্রসারণ। তারপর রোমানরা তার কাছে তাদের শক্তি এবং সরঞ্জাম নিয়ে গর্ব করল। তখন মু'য়ায তাদের কাছে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

'অনন্তর যখন তালূত সৈন্যদলসহ বের হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন; অতঃপর তা হতে যে পান করবে সে কিন্তু আমার দলভুক্ত থাকবে না এবং যে স্বীয় হাত দ্বারা আঁজলাপূর্ণ করে নেবে, তদ্ব্যতীত যে তা আস্বাদন করবে না সে নিশ্চয় আমার; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প লোক ব্যতীত আর সবাই সেই নদীর পানি পান করলো, অতঃপর যখন সে ও তার সঙ্গী বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বলল, জালূতের ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই; পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করতো যে তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে, বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আল্লাহ রয়েছেন'।[৪৩] আল-মাসউদী রহ. বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব ও পারস্যের অনেক রাজার সাথে লেভান্ট[৪৪] এবং ইরাক ভ্রমণের অনেক গল্প রয়েছে।... তার আমলে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী এবং মিশর, লেভান্ট, ইরাক এবং অন্যান্য দেশ বিজয়ের কথাও পাওয়া যায়'।[৪৫]

৩.৫.৩ উসমান ইবনু আফফান রা. এর যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক

উমার ইবনু খাত্তাব রা. এর ইন্তিকালের পর উসমান ইবনু আফফান রা. ২৩ হিজরী মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মুহাররম মাসের ৩ তারিখে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ৩৫ হি./৬৫৬ খ্রি. পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬] উসমান রা. খিলাফত গ্রহণের পর অনেক বার্তাবাহক এবং বিদেশী দূত গ্রহণ এবং তাদের আবাসন ব্যয় বহন করার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে কিছু নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।[৪৭] তিনি সর্বপ্রথম কূটনীতিবিদদের নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এ সম্মেলনে অনেক বড় বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।[৪৮] তাঁর খিলাফতকালে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে কূটনীতিবিদ হিসেবে তৎকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ওয়ালিদ ইবনু উকবাহ। তিনি আজারবাইজানের প্রধানের সাথে সন্ধি বিষয়ক আলোচনার জন্য খলীফা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হাবীব ইবনু মাসলামা তালকিসবাসীদের সাথে সংলাপের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আহনাফ ইবনু কায়সকে মারভে কূটনীতিবিদ হিসেবে পাঠানো হয়।[৪৯] এযুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের সম্প্রসারণ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। তাই তিনি প্রদেশের গভর্নর, সেনাপতি, কর আদায়কারী এবং সাধারণ মুসলমানদের শহরে লোক পাঠান, ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে অসংখ্য গ্রন্থও লেখার ব্যবস্থা করেন।[৫০]

উসমান ইবনু আফফান রা. এর খিলাফতকালে তিনি বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে: মিশরে কিছু গোলযোগ দেখা দিলে তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে সেখানে কী ঘটছে তা জানার জন্য পাঠান। পরবর্তীতে খলীফা 'উসমান ইবনে আফফান রা. মহান সাহাবী হাবারা ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারীকে মিশরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি মিশরের জনগণের কাছে একটি বার্তা এবং অঙ্গীকার বহন করেছিলেন যে, প্রতিটি নির্বাসিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, প্রতিটি বঞ্চিত ব্যক্তিকে কিছু না কিছু দেয়া হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ বাস্তবায়ন করা হবে। তাই মিশরবাসীরা তাকে স্বাগত জানালো, তার অনুরোধে সম্মত হলো। আর এভাবেই তার কূটনৈতিক মিশন সফল হয়েছিল'।[৫১] অতঃপর আলী ইবনু আবী তালিব রা. কতিপয় আনসার ও মুহাজিরদের সাথে নিয়ে মিশরের জনগণের কাছে প্রেরিত হন।[৫২]

৩.৫.৪ আলী ইবনু আবী তালিব রা. এর যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক

কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলী ইবনু আবী তালিব রা.-এর যুগ ছিল নবী সা. এবং তাঁর পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেরই একটি সম্প্রসারণ রূপ। আলী রা. খিলাফতে আসীন হওয়ার পর কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উসমানের রা. আমলে কূটনৈতিকদের সংখ্যা যা ছিল তার চেয়ে তিনি এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। মুসলিম জাহানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় তিনি কূটনীতিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন।[৫৩] আলী রা.-এর খিলাফতকালে প্রতিনিধিদল গ্রহণ এবং বার্তা প্রেরণ করা হত।[৫৪] যেমন: নাজরানের জনগণ যখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনু আবী তালিব রা.-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তিনি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব রা.-এর তরফ থেকে নাজরানের অধিবাসীদের জন্য লিখিত একটি দলীল। তোমরা আমার কাছে আল্লাহর রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে একটি দলীল নিয়ে এসেছ, যাতে তিনি তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের হেফাজত এবং তোমাদের ওপর কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। আমি তোমাদের প্রতি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করছি, যা রাসূলুল্লাহ সা., আবু বকর রা. ও উমর রা. তোমাদের জন্য স্থির করেছিলেন। মুসলিমদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের স্থানে যাবে, সে যেন এই চুক্তি রক্ষা করে, তাদের কোনো ধরনের ক্ষতি না করে, কোনো অবিচার না করে এবং তাদের কোনো অধিকার খর্ব না করে।'[৫৫]

৪. উপসংহার

বিশ্ব মানবতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের কার্যকর ও স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত কূটনীতি। যা মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ও পর্যায় অতিক্রম করে এটি বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কূটনৈতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্র. সম্পা.), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২ খ্রি./কার্তিক ১৪১৯ ব.), পৃ. ২৮১; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সং.), *সংসদ বাংলা অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ৫ম সংস্করণ ও পুনঃমুদ্রণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৪০।

[২] J M. COWAN (Edi.), *THE HANS WEHR DICTIONNARY OF MODERN WRITTEN ARABIC* (Arbana IL, United States: Spoken Language Services, Inc., 4th edition.), p. 313.

[৩] Sir Ernest Sattow, *A Guide to Diplomatic Practice* (United Kingdom: Cambridge University Press, September 2011), 1-4.

[8] Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics* (New York: Macmillan Co., 1962), p. 314.

[৫] এনসাইক্লোপিডিয়া বিজনেস ফাউন্ডেশন, *আল-মাওসূ'আতুল 'আরাবিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ* (এনসাইক্লোপিডিয়া বিজনেস ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৬১।

[৬] মিশরীয় সোসাইটি, *আল-মাওসূ'আতুল 'আরাবিয়্যাহ আল-মুওয়াসসারাহ* (বৈরূত: দারুল জাইল, ২য় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০৭৯।

[৭] 'আব্দুল 'আযীয মুহাম্মাদ সারহান, *কানূন আল-'আলাকাত আদ-দিবলুমাসিয়্যাহ ওয়াল কানসালিয়্যাহ* (কায়রো: জামি'আতু আ'ইন শামস, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১০।

[৮] ফাযিল যাকী মুহাম্মাদ, *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ বাইনান নাযরিয়্যাহ ওয়াত তাতবীক* (বাগদাদ: মুতাবিউ দারিল জামহুরিয়্যাহ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।

[৯] আব্দুল্লাহ আল আমিন, এস এম নাসির উদ্দীন, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলনীতি* (ঢাকা: এন এস পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২২৩।

[১০] প্রফেসর ইয়াসমিন আহমাদ ও রাখি বর্মণ, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচিতি* (ঢাকা: আজিজিয়া বুপ ডিপো, ২য় সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৯২।

[১১] 'আলী হুসাইন আশ-শামী, *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ, নাশয়াতুহা ওয়া তাতাওওয়ারুহা ওয়া নিযামুল হাসানাত ওয়াল ইমতিয়াযাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল 'ইলমি লিল মুলাবীন, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

[১২] *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ বাইনান নাযরিয়্যাহ ওয়াত তাতবীক*, পৃ. ১৫।

[১৩] ড. 'আব্দুল ফাত্তাহ 'আলী রাশদান ও ড. মুহাম্মাদ খালীল আল-মূসা, *উসূলুল 'আলাকাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়ান কানসালিয়্যাহ* ('আম্মান: আল-মারকাযুল 'ইলমী লিদ দিরাসাতিস সিয়াহসিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

[১৪] হ্যারল্ড নীকলসন, *তাতাওওয়ারুল মিনহাজিদ দিবলূমাসিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুল আনজালুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩০-৩১।

[১৫] *উসূলুল 'আলাকাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়ান কানসালিয়্যাহ*, পৃ. ৩৫।

[১৬] *আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূলনীতি*, পৃ. ২২৩।

[১৭] মুহাম্মাদ আল-মাজযূব, *আল-'আলাকাতুল দাওলিয়্যাহ* (বৈরূত: মাকতাবাতু মুকাভী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৩৮।

[১৮] *উসূলুল 'আলাকাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়ান কানসালিয়্যাহ*, পৃ. ৩৬।

[১৯] 'ঈযযুদ্দীন ফাওদাহ, *আন-নাজমু আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ* (কিতাবুল আওয়াল ফী তাতাওওয়ারিল দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়া তাকনীন কাওয়াঈদুহা (কায়রো: দারুল ফিকরুল 'আরাবী, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৪৭-৪৮।

[২০] 'আলী সাদিক আবূ হাইফ, *আল-কানূন আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ* (আল-ইসকান্দারিয়্যাহ: মানশায়াতুল মা'আরিফ, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[২১] *আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূলনীতি*, পৃ. ২২৩।

[২২] *আন-নাজমু আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ*, পৃ. ১০৮; Steren Runciman, *Byzantine Civilization* (New York: Meridian Books, 1956), p. 9-240.

[২৩] *তাতাওওয়ারুল মিনহাজিদ দিবলূমাসিয়্যাহ*, পৃ. ১।

[২৪] 'আদনান আল-বিকরী, *আল-'আলাকাতুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়াল কানসূলিয়্যাহ* (কুয়েত: কাযিমাতু লিন নাশরি ওয়াত তারজুমাতি ওয়াত তাওযী', ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৪।

[২৫] *আন-নাজমু আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ*, পৃ. ১০৮; *উসূলুল 'আলাকাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ ওয়ান কানসালিয়্যাহ*, পৃ. ৩৯।

[২৬] *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ, নাশয়াতুহা ওয়া তাতাওওয়ারুহা ওয়া নিযামুল হাসানাত ওয়াল ইমতিয়াযাত আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ*, পৃ. ৭৫-৭৬; *আন-নাজমু আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ*, পৃ. ১০৮-১১৫।

[২৭] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* (রাজশাহী: রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২৬১-২৬২।

[২৮] হালীমা 'আযাভী, *উসূলুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ইসলাম: দিরাসাতান মুকারানাতান বিল কানূনিল ওয়াযঈ* (মাস্টার্সের থিসিস) (জামি'আতু ঘারাদিয়্যাহ, আলজেরিয়া: ওয়াযারাতুত তা'লীমল 'আলী ওয়াল বাহাসিল 'ইলমী, সেশন ১৪৩৬-১৪৩৭ হি./২০১৫-২০১৬ খ্রি.), পৃ, ২৩।

[২৯] আবূ জা'ফর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুত তুরাস, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৭ হি.), পৃ. ৬৪৫।

[৩০] সুহাইল হুসাইন আল-ফাতলাবী, *আল-'আলাকা-তুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ওয়াতানিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৪৩।

[৩১] *উসূলুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ইসলাম: দিরাসাতান মুকারানাতান বিল কানূনিল ওয়াযঈ*, পৃ, ২৪।

[৩২] মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী, *আল-মুসতাদরাকু 'আলাস সহীহাইন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণম ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৪৩৭৭।

[৩৩] *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃ. ২৬৮।

[৩৪] সুহাইল হুসাইন আল-ফাতলাবী, *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ: দিরাসাতান মুকারানাতান বিলকানূনিদ দাউলী আল-মু'আসির* ('আম্মান: দারুস সাকাফাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২১২।

[৩৫] ড. 'আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু শাখসিয়্যাতুহু ওয়া 'আসরুহু* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ,৭ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৯-১৬১।

[৩৬] *আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ: দিরাসাতান মুকারানাতান বিলকানূনিদ দাউলী আল-মু'আসির*, পৃ. ২১২।

[৩৭] *তারীখুল রুসুল ওয়াল মুলূক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

[৩৮] মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, *আস-সিদ্দীক আবূ বাকর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৮৫।

[৩৯] হিশাম জাবলাহ ইবনে আল-আয়হাম ত্যাগ করার পর রোমান রাজা হেরাক্লিয়াসের সাথে দেখা করার জন্য এন্টিওক শহরে যান। তিনি এবং তার সাথে থাকা মুসলিমরা তাদের ঘোড়ায় চড়ে শহরের দরজায় প্রবেশ করেন এবং হিরাক্লিয়াস তাদের দেখছিলেন, যখন তার সাথে থাকা রোমানরা শহরের মাঝখান থেকে দেখছিল। তারা তাদের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকে যতক্ষণ না লোকেরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তারপর হিরাক্লিয়াস তাদের ডেকে পাঠান কারণ তারা তার সামনে তাদের ধর্ম প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেনি। তিনি তাদের প্রবেশের অনুমতি দেন কারণ তারা মুসলিম বার্তাবাহক ছিলেন, তাই তারা তার কাছে পূর্ণ পোশাকে প্রবেশ করেন। হিরাক্লিয়াস তার পদ, মর্যাদা এবং সম্পদ হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি প্রতিনিধিদলের জন্য একটি মূল্যবান পুরস্কারের আদেশ দেন, কিন্তু প্রতিনিধিদল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর তারা ফিরে এসে সেনাপতি আবু উবাইদাহ আমির ইবনুল জাররাহের সাথে দেখা করে এবং তাকে জাবলাহ ইবনুল আইহাম এবং হিরাক্লিয়াসের সাথে যা ঘটেছিল তা জানায়। তখন আবূ উবাইদা (রা.) তাদের জবাবে বলেন, 'আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি'। দ্র.: সূরাহ আল-বাকারাহ: ৭; আহমাদ ইসমা'ঈল আল-জাবূরী, *আত-তারীখ আদ-দিবলূমাসী* ('আম্মান: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৯।

[৪০] ইবনুল ফাররা, *রাসাইলুল মুলূক*, তাহকীক: সালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২৪৭; গৃহীত: *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃ. ২৬৯।

[৪১] *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃ. ২৬৯।

[৪২] মুহাম্মাদ হাবাশ, *আল-ইসলাম ওয়াদ দিবলূমাসিয়্যাহ কিরায়াতান ফিল কাইয়িম আদ-দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ইসলাম* (প্রকাশ স্থান, প্রকাশ ও সংস্করণ বিহীন, ১৪৩৫ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

[৪৩] সূরাহ আল-বাকারাহ: ১৪৯; *উসূলুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ইসলাম: দিরাসাতান মুকারানাতান বিল কানূনিল ওয়াযঈ*, পৃ, ২৮-২৯।

[৪৪] **লেভান্ট:** এটি পূর্ব ভূমধ্যাঞ্চল নামেও পরিচিত, আনাতোলিয়া এবং মিশরের মাঝে অবস্থিত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল। বর্তমানের সাইপ্রাস, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইসরাইল এবং দক্ষিণ তুরস্ক (পুরাতন নাম আলেপ্পো ভিলায়েত) এর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিলো। পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ভূমধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা এবং আরব অঞ্চল এর উত্তর-পশ্চিমাংশের সাথে সংযোগ অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত ছিলো।

[৪৫] আবুল হাসান আল-মাসঊদী, *মুরূজুয যাহাব ওয়া মি'দানুল জাওহার*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./ ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫।

[৪৬] হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম আস-সিয়াসাহ ওয়াত দ্বীনী ওয়াস সাকাফী ওয়া ইজতিমা'ঈ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল জাইল, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২০৬।

[৪৭] ইবরাহীম আহমাদ আল-'আদাভী, *আল-মুসলিমূনা ওয়াল জুরমান* (কায়রো: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৮১।

[৪৮] *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃ. ২৭০।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭১।

[৫০] *তারীখুল রুসুল ওয়া মুলূক*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

[৫১] আহমাদ ইসমা'ঈল আল-জাবূরী, *আত-তারীখুদ দিবলূমাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৫২] *উসূলুদ দিবলূমাসিয়্যাহ ফিল ইসলাম: দিরাসাতান মুকারানাতান বিল কানূনিল ওয়াযঈ*, পৃ, ৩০।

[৫৩] *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃ. ২৭১।

[৫৪] আহমাদ ইসমা'ঈল আল-জাবূরী, *আত-তারীখুদ দিবলূমাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[৫৫] এই চিঠি লিখেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু রাফি। তারিখ: ১০ই জমাদাল আখিরা, ৩৭ হিজরি/৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ। রাসূলুল্লাহ সা. যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন থেকে গণনা অনুযায়ী। দ্র.: আল-কাযী আবী ইউসুফ ইয়া'কূব ইবনু ইবরাহীম, *কিতাবুল খারাজ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৭৪।